গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬০ বর্ষ বিশেষ বুলেটিন, ১৫ অক্টোবর ২০০৭ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ১.০০ টাকা

রেজওয়ানুরের খুনিদের শাস্তি দিতে সরকারকে বাধ্য করা যায় একমাত্র গণআন্দোলনের চাপেই

পার্কসার্কাসের জনসভায় কমরেড প্রভাস ঘোষ

(গত ১০ অক্টোবর পার্কসার্কাসের সামসুল হুদা রোডে রেজওয়ানুরের বাড়ির সামনের রাস্তায় অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় সভাপতিত্ব করেন এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। ঐ সভায় এস ইউ সি আই-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ যে বক্তব্য রাখেন এখানে তা প্রকাশ করা হল। সভার পর কমরেড প্রভাস ঘোষ ও দেবপ্রসাদ সরকার সন্তানহারা মা কিসোয়ার জাহানের কাছে যান এবং গভীর সমবেদনা জানান।)

কমরেড সভাপতি, কমরেডস ও বন্ধুগণ,

আপনারা জানেন, এই এলাকার অত্যন্ত সৎ, ভদ্র এবং সকলের প্রিয়পাত্র, ছাত্র ও সহকর্মীদের খুবই প্রিয় ও শ্রদ্ধাভাজন যুবক শিক্ষক রেজওয়ানুরের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ও ন্যায় বিচারের দাবিতে আজকে এস ইউ সি আই দলের কলকাতা জেলা কমিটির উদ্যোগে এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বাস্তবে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সমগ্র রাজ্যের জনচিত্তকে যেভাবে ব্যথিত, আলোড়িত ও ক্ষুব্ধ করে তুলেছে, সাম্প্রতিককালে এরকম আর দেখা যায়নি। তার কারণও আছে। আমরা জানি, পুলিশ প্রশাসন, রাজ্য সরকার এবং শাসক সিপিএম দল এই হত্যাকে যতই আত্মহত্যা বলে প্রতিষ্ঠিত করার চক্রান্ত করুক, আজ পশ্চিমবঙ্গের কয়েক কোটি মানুষ কিন্তু জানে, কারা কেন ষড়যন্ত্র করে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় এই হত্যাকাণ্ড সংগঠিত করেছে এবং তারা এটাও মনে করে, তদন্তের নামে যা কিছু হচ্ছে তাতে সবকিছু ধামাচাপা দেওয়ারই আয়োজন করা হয়েছে। আপনারা জানেন, দুইজন প্রাপ্তবয়স্ক যুবক-যুবতী রেজওয়ানুর ও প্রিয়ঙ্কা ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠে পরস্পরকে ভালবেসে বিবাহ করে। এটা শুধু আইনসঙ্গতই নয়, মানবিকতা ও নৈতিকতাসম্মতও। এটাও লক্ষণীয় ও প্রশংসনীয় ধর্মীয় গোঁড়াদের চাপ সত্ত্বেও রেজওয়ানুর ও তার পরিবার প্রিয়ঙ্কাকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেনি এবং খুবই ধনী পরিবারে প্রাচুর্যে ও আরামে মানুষ হওয়া সত্ত্বেও প্রিয়ঙ্কা স্বেচ্ছায় ভালবেসে এই অতি দরিদ্র পরিবারে সুখে ঘর করতে এসেছিল, সে স্বামীর কাছে আব্দার করেনি যে বড়লোক পাড়ায় আলাদা ফ্ল্যাটে তাকে নিয়ে থাকতে হবে, যা আজকাল আকছার হয়।

রেজওয়ানুর যা রোজগার করত, তাতে আলাদা থাকলে নিশ্চয়ই মোটামুটি সচ্ছল থাকতে পারত, কিন্তু সে বৃদ্ধা মা, ভাইয়ের সংসার, বোনেদের দায়িত্ব সবকিছু নিয়েই দারিদ্রের মধ্যেই ছিল। বিরাট টাকার প্রলোভন, অনেক চাপ, থ্রেট সত্ত্বেও সে ও তার পরিবার প্রিয়ঙ্কাকে বাপের বাড়ি ফিরিয়ে দিতে চায়নি এবং প্রিয়ঙ্কাকেও বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করেও বিয়ে ভাঙতে রাজি করানো যায়নি, আর এজন্যই শেষ পর্যন্ত রেজওয়ানুরকে এভাবে প্রাণ দিতে হলো। তারা হয়ত অন্য কোথাও গোপনে পালিয়ে বাঁচতে পারত, তারপর হয়ত বেশকিছু দিন বাদে মেয়ের পরিবার মেনে নিতে বাধ্য হতো। কিন্তু তারা এই গোপনীয়তার আশ্রয় নেয়নি। তারা মর্যাদার সাথে মাথা উঁচু করে সমাজের মাঝে বাস করতে চেয়েছিল, তারা বিশ্বাস করেছিল মেয়ের ধনী পিতা যতই চাপ দিক, জুলুম করুক, যেহেতু তারা আইন মেনে ভদ্রভাবে বিবাহিত জীবন যাপন করতে চেয়েছে, আইনের রক্ষকেরা নিশ্চয়ই তাদের নিরাপত্তা দেবে। তাদের তখনও বুঝতে বাকি ছিল এই আইনের রক্ষকেরা প্রয়োজনে কীভাবে নির্মম ভক্ষক হয়।

এটা হত্যা না আত্মহত্যা, কীভাবে তদন্তের নামে প্রহসন হচ্ছে, এই মূল বিষয়ে যাওয়ার আগে আপনাদের কাছে প্রাসঙ্গিক গণ্য করে আরও কয়েকটি বিষয় রাখতে চাই। আপনারা জানেন, আমাদের দেশে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিবাহ আজও তেমন প্রচলন ঘটেনি, মেনে নেওয়ার মত সেই ধরনের সেক্যুলার গণতান্ত্রিক মানসিকতা আজও সমাজজীবনে গড়ে ওঠেনি। আমাদের দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বহুদিন আগেই দেখিয়ে গেছেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন বৃহৎ জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে দক্ষিণপন্থী আপসকামী, সংস্কারপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্বের দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় শ্রমিক বিপ্লবে ভীত হয়ে সেই নেতৃত্ব একদিকে যেমন ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং-সুভাষ বোসদের বিপ্লববাদী রাজনীতিকে সামনে আসতে দিতে চায়নি, অন্যদিকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর-শরৎচন্দ্র-নজরুলদের রেনেশাঁস বা সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে অবহেলা করে পুরানো মধ্যযুগীয় ধর্মীয় ঐতিহ্যবাদের সাথে আপস করেছে। ফলে হিন্দু সমাজে আজও সতীদাহের চিতার আগুন নেভেনি, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে সতী হওয়ার আকুলতা আজও জেগে আছে, বিধবা বিবাহ অনুচিত-অধর্ম বলে আজও অগ্রাহ্য হয়, বাল্যবিবাহ আজও অব্যাহত আছে, কন্যা সন্তান দায় বলে আজও অনাদরে লাঞ্ছিত হয়, কন্যাভ্রূণ হত্যা তো অব্যাহত গতিতে এগিয়ে চলেছে; নারীর মুক্তি, নারীর অধিকার, প্রেমের অধিকার এসব তো এখনও মূলত বক্তৃতায়, প্রবন্ধ রচনায় আবদ্ধ আছে। সর্বশেষ ধর্মের প্রবর্তক হিসাবে হজরত মহম্মদ সেই যুগে ইসলামে নারীকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার দিয়েছিলেন যা ইতিপূর্বে কোন ধর্ম দেয় নি, যেমন — কন্যার সম্মতি ছাড়া পাত্র নির্বাচন করা যাবে না, কন্যাও সম্পত্তির অধিকারী হবে, পুরুষকে বহুবিবাহের পরিবর্তে ৪টি বিবাহে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এবং প্রথম স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া স্বামীর দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলবে না এবং সকল স্ত্রীর প্রতি সমান দায়িত্ব পালন করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে যুগের পরিবর্তনের সাথে গোঁড়ারা সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পারায় ধর্মান্ধ মুসলিম সমাজে এগুলি শুধু কথার কথাতেই থেকে গেছে তাই নয়, কথায় কথায় তালাক দেওয়া, খোরপোষ দিতে অস্বীকার করা, সন্তান সমেত পূর্বতন স্ত্রীকে রাস্তায় বের করে দিয়ে পুনরায় একাধিক বিয়ে করা, এমনকী শ্বশুর কর্তৃক ধর্ষিতা পুত্রবধূকে ধর্মের নামে শ্বশুরকে বিয়ে করার ফতোয়া দেওয়া,— এগুলিই আজ অনেকাংশে ধর্মের নামে প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যত দিন যাচ্ছে, মৌলবাদ-ধর্মান্ধতা-প্রতিক্রিয়াশীলতা যত বাড়ছে, গণতান্ত্রিক চেতনা, প্রগতিশীলতা ও গণআন্দোলন যত দুর্বল হচ্ছে, ততই ধর্মান্ধ হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে এইসব বাড়ছে। এইরকম অবস্থায় দেশে আজও ভিন্ন ধর্মে ও জাতে বিয়ে আইনসঙ্গত হলেও সমাজে প্রায় অস্বীকৃতই থেকে গেছে। আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, সেইযুগে কবি নজরুল হিন্দু ঘরের কন্যা প্রমীলাকে বিয়ে করেছিলেন। এই বিয়ে নিয়েও সেদিন ঝড় উঠেছিল, নজরুলের পরিবার ও প্রমীলার মা ছাড়া তার পরিবার এই বিয়ে মেনে নিতে পারেনি। যদিও রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্ররা নজরুলদের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এটাও সকলেই জানেন, সুভাষচন্দ্র বিদেশে খৃষ্টান এমিলি শেঙ্কলকে বিয়ে করেছিলেন। যদিও এগুলি সবই ব্যতিক্রমী ঘটনা। যে হিন্দুরা বিবেকানন্দকে অবতার বলে গণ্য করে, তারা কি জানে স্বয়ং বিবেকানন্দ একদিন বলেছিলেন, 'এটা খুবই স্বাভাবিক যে একই সময়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং নির্বিরোধে আমার ছেলে বৌদ্ধ, আমার স্ত্রী খৃষ্টান এবং আমি নিজে মুসলমান হতে পারি।' এই বিবেকানন্দকে হিন্দুরা কি হিন্দু বলে স্বীকার করবেন! এরা বোঝে না, ধর্ম মানা আর ধর্মীয় আচার ও কুসংস্কার মানা, এক নয়।

আমাদের দল যথার্থ মার্কসবাদী হিসাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভালবাসার স্বাধীনতা ও বিবাহকে ন্যায়সঙ্গত ও গণতান্ত্রিক অধিকার হিসাবে গণ্য করে, আমরা সব সময়ই এর পক্ষে। আরও বিশেষ কারণে সামাজিক আন্দোলন হিসাবে একে আমরা চাই ও উৎসাহ দিই। সেই কারণটি ব্যক্ত করে আমাদের মহান শিক্ষক কমরেড শিবদাস ঘোষ ১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত জাতীয় গণতান্ত্রিক সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে এক বার্তায় বলেছিলেন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গারোধে একদিকে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আদর্শগত ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, অন্যদিকে সামাজিক

দুয়ের পাতায় দেখুন

১০ অক্টোবর পার্কসার্কাসের সামসুল হুদা রোডে রেজওয়ানুরের বাড়ির সামনের রাস্তায় অনুষ্ঠিত জনসভায় বক্তব্য রাখছেন কমরেড প্রভাস ঘোষ। পাশে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার।

রেজওয়ানুর-প্রিয়ঙ্কা মর্যাদাময় জীবনযাপনের স্বপ্ন দেখেছিল

ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মেলামেশার পরিবেশ গড়ে তোলা এবং ভিন্নধর্ম ও জাতের মধ্যে বিবাহ প্রসারকে কার্যকরীভাবে সাহায্য করা ইত্যাদি করতে হবে। এই শিক্ষা নিয়েই এই ধরনের বিবাহের পক্ষে আমরা দাঁড়াই।

কমরেড শিবদাস ঘোষের আরেকটি শিক্ষা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে মূল আলোচনায় যেতে চাই। তিনি বলেছিলেন, সেক্যুলার হিউম্যানিজিমের ধারণাটা এসেছে ইউরোপের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে। সেক্যুলার কথাটার আভিধানিক, মর্মাথগত এবং ঐতিহাসিক অর্থ হচ্ছে অপার্থিব অতিপ্রাকৃত শক্তির, ঐশ্বরিক শক্তির অস্বীকৃতি। ইউরোপে বুর্জোয়ারা যখন ধর্মের মদতপুষ্ট রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঝান্ডা বহন করেছিল, তখন তারাই এই বিজ্ঞানসম্মত গণতান্ত্রিক চিন্তা নিয়ে এসেছিল, যদিও পরবর্তীকালে প্রতিক্রিয়াশীল স্তরে বুর্জোয়ারাই পুনরায় ধর্মীয় ঐতিহ্যের সাথে আপস করেছে। ফলে সেক্যুলার হিউম্যানিজম হচ্ছে, রাষ্ট্র-রাজনীতি-অর্থনীতি-শিক্ষা ও সামাজিক জীবনের সাথে ধর্মের সম্পর্ক থাকবে না, ধর্ম হবে ব্যক্তিগত বিশ্বাস। আমাদের দেশে বিদ্যাসাগর, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচন্দ, ভগৎ সিং, সুভাষচন্দ্ররা এই সেক্যুলারইজমের ঝাণ্ডা বহন করেছিলেন। কিন্তু দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃত্ব এই সেক্যুলারইজমের নূতন ব্যাখ্যা দাঁড় করায়— সকল ধর্মের প্রতি সমান উৎসাহ দেওয়া। কিন্তু এমনকী একথা মুখে বললেও এই নেতৃত্ব মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতৃত্ব হিসাবেই কাজ করেছে, যার জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে শুধু অধিকাংশ মুসলমান জনগণকেই নয়, অধিকাংশ তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দু ও জনজাতি জনগণকেও যুক্ত করা যায়নি, যার কুফল আজও ভুগতে হচ্ছে। এখন কংগ্রেস সিপিএম, তৃণমূল সকলেই সেক্যুলারিজমের তকমা লাগিয়ে ঘোরে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাঙ্কের দিকে তাকিয়ে। এদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে ধর্মীয় মানসিকতা প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে নানা যুক্তির দোহাই দিয়ে, যার সাথে সেক্যুলারিজমের কোন সম্পর্কই নেই। এরা দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করে। এরা চায় সংখ্যালঘুরা, দলিত ও জনজাতিরা সর্বদিক থেকে বঞ্চিত, অত্যাচারিত ও বিপন্ন থাকুক, তাহলে তারা প্রয়োজনে ত্রাতা সেজে এবং রিজার্ভেশনের ঝুলি নিয়ে দয়া-দাক্ষিণ্য দেখিয়ে ভোটে স্বার্থ সিদ্ধি করতে পারবে। এই দেশের রাষ্ট্র, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, পুলিশ-প্রশাসন, বিচার বিভাগ সর্বত্রই সেক্যুলারিজমের সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দু ধর্মীয় মানসিকতাই কাজ করছে। অন্যদিকে কিছু দল দলিত ও সংখ্যালঘুদের ত্রাতা সেজে তাদের পুঁজিবাদ বিরোধী ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে ভোটের রাজনীতি করছে।

আপনাদের বুঝতে হবে, রেজওয়ানুর-প্রিয়ঙ্কার এই বিবাহিত জীবনকে হত্যা করা এবং রেজওয়ানুরকে খুন করার জন্য শুধু ব্যক্তি অশোক টোডি ও লালবাজারের কয়েকজন পুলিশ কর্তাই দায়ী নয়, দায়ী হচ্ছে সমাজের এই বুর্জোয়া শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গি যে, ধনী ও গরিবের সন্তানরা পরস্পরকে ভালবাসতে ও বিয়ে করতে পারবে না এবং তার সাথে যুক্ত হয়ে আছে মধ্যযুগীয় মানসিকতা যে হিন্দু ও মুসলিম সন্তান পরস্পরকে ভালবাসতে ও বিয়ে করতে পারবে না।

রেজাওয়ানুর ও প্রিয়ঙ্কা জানত, তাদের কী ঘটতে পারে। কোনও দিন কি শুনেছেন, সদ্য বিবাহিত দম্পতি একত্রে ঘর করার আগেই একাধিক থানায়, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানদের কাছে চিঠিতে বৈধ ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও বার্থ সার্টিফিকেট পাঠিয়ে বিপদের আশঙ্কা জানিয়ে নিরাপত্তার জন্য প্রথম আকুল আবেদন করেছে। প্রথম থেকেই কী রকম আতঙ্কে থাকলে ও বিপন্নবোধ করলে তারা এই রকম চিঠি লিখতে পারে, আপনারা ভেবে দেখুন। ৩০ আগস্ট রেজওয়ানুর ও প্রিয়ঙ্কা স্বাক্ষর করে এই চিঠি পাঠিয়েছিল, প্রিয়ঙ্কার বাড়ি যে জেলার অন্তর্গত সেই উত্তর চব্বিশ পরগণার এস পি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, ডি সি সাউথ, বিধাননগর-এন্টালি-কড়েয়া থানার ও সি-দের ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যানকে। **এই চিঠিতে তারা সরাসরি আশঙ্কা জানিয়ে লিখেছিল, 'আমরা আশঙ্কা করছি, আমাদের শ্বশুর/বাবা অশোক টোডি ভয়ঙ্কর পরিণতির জন্য আমাদের হুমকি দেবেন অথবা চাপ দেবেন অথবা গুণ্ডা বা সমাজবিরোধী পাঠিয়ে আমাদের অপহরণ করাবেন। সেজন্য যদি প্রয়োজন হয়, আমরা আপনার পক্ষ থেকে নিরাপত্তার ব্যবস্থা পাব বলে আশা করছি।'** এই অবস্থায় ন্যূনতম আইনগত কর্তব্য পালনের ইচ্ছা থাকলে এই পুলিশ কর্তাদের কী করণীয় ছিল? তাদের কর্তব্য ছিল অশোক টোডিকে ডেকে পাঠিয়ে কৈফিয়ৎ চাওয়া— কেন এরা এরকম চিঠি লিখতে বাধ্য হলো এবং কোনওভাবে এদের নিরাপত্তার যাতে বিঘ্ন না ঘটে তার জন্য টোডিদের সতর্ক করা। কিন্তু পুলিশ প্রশাসন কী করল? ৩১ আগস্ট রাতে অশোক টোডি যখন রেজওয়ানুরের বাড়িতে গিয়ে প্রিয়ঙ্কাকে ফিরে যাওয়ার কথা বলে বারবার ব্যর্থ হলো, তারপর রেজওয়ানুর ও তার পরিবারকে এই বিয়ে ভাঙার জন্য ব্ল্যাঙ্ক চেকে প্রচুর টাকার প্রলোভন দিয়েও রাজি করাতে পারলো না, তখন চাপ ও থ্রেট দিতে শুরু করলো, সেই সময়ে একই সাথে কড়েয়া থানার পুলিশ অফিসাররা এসেও থ্রেট দিল। সকলকে হাতকড়া লাগাবার হুমকিও দিল। এর পরদিন ১ সেপ্টেম্বর লালবাজারেও এই নবদম্পতিকে একইভাবে ডেকে এনে প্রিয়ঙ্কাকে বাপের বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্য চাপ দিল। কিন্তু প্রিয়ঙ্কা ফিরে যেতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করল। ৩ সেপ্টেম্বর কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ক্রিমিনাল রেজওয়ানুরের বাড়িতে এসে প্রিয়ঙ্কাকে ছেড়ে দিতে বলল, না হলে রেজওয়ানুরের জান নেবে বলে হুমকি দিয়ে গেল। ঐ দিনই এই থ্রেটের কথা জানিয়ে রেজওয়ানুর সাউথ ডি সি-কে চিঠি পাঠায় এবং অন্যদের তার কপি দেয়। এই নিয়েও পুলিশ কোন তদন্ত করল না, বরং ৪ সেপ্টেম্বর আবার রেজওয়ানুর ও প্রিয়ঙ্কাকে লালবাজারে ডেকে আরও বেশি চাপাচাপি করতে শুরু করলো। এবারও ওরা রাজি হল না। এতেও যখন কাজ হল না, তখন পুলিশ ও টোডিরা অন্য পথ ধরলো। হঠাৎ ৭ সেপ্টেম্বর প্রিয়ঙ্কার কাকীমা এসে জানালো, প্রিয়ঙ্কার বাবা গুরুতর অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে আছে, ওকে এখুনি ওদের সাথে যেতে হবে। প্রিয়ঙ্কার হয়ত কিছু সন্দেহ হয়েছিল, তাই ওদের সাথে যেতে রাজি না হয়ে সে আলাদা গিয়ে বাবাকে দেখে আসবে বলে জানাল। এরপরই লালবাজারে মঞ্চস্থ হলো জঘন্য ষড়যন্ত্রের আসল নাটক। প্রিয়ঙ্কা-রেজওয়ানুরকে তলব করে নিয়ে এলো ৮ সেপ্টেম্বর। প্রিয়ঙ্কাকে আলাদা করে ডেকে তার আত্মীয়রা ও দুই জন অফিসার অনেকক্ষণ বোঝাল, কিন্তু বোঝা যায় বাড়ি ফিরে যেতে রাজি করাতে ওরা সক্ষম হয়নি। কারণ প্রিয়ঙ্কা রাজি হয়ে থাকলে রেজওয়ানুরকে থ্রেট দেওয়ার দরকার হতো না। ওরা বেরিয়ে এসে রেজওয়ানুর ও তার পরিবারের সাথে বসে নানা চাপ দিতে থাকে, তাতে ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত থ্রেট দেয় যে, রাজি না হলে অশোক টোডির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ রেজওয়ানুরকে অর্থ ও অলঙ্কার চুরির দায়ে হাজতে পুরবে, আর রাজি হলে টোডিরা লিখে দেবে যে সাত দিনের মধ্যে প্রিয়ঙ্কাকে শ্বশুর বাড়িতে ফেরত পাঠাবে। থ্রেটের মুখে শেষ পর্যন্ত রেজওয়ানুরেরা একথা মেনে নিতে বাধ্য হয়। এ যেন বুকে পিস্তল ঠেকিয়ে রাজি করানো। এভাবেই পুলিশ উদ্যোগী হয়ে প্রিয়ঙ্কাকে অশোক টোডির হাতে তুলে দেয়। এরপর একের পর এক ছক করা ষড়যন্ত্র কার্যকর হতে থাকে। ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রিয়ঙ্কার সাথে রেজওয়ানুরের ফোনের যোগাযোগ থাকে এবং ও প্রতিশ্রুতি দেয় ফিরে আসবে। শেষ ফোনটি আসে ১১ সেপ্টেম্বর। এই ফোনের বক্তব্য ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। প্রিয়ঙ্কা বলে, ওর আসতে আরও দেরি হবে, সেজন্য রেজওয়ানুর অপেক্ষা করবে কি না। রেজওয়ানুর সম্মতি জানায়। প্রিয়ঙ্কা অনুরোধ করে, রেজওয়ানুর যেন আইনের পথে না যায় এবং সংবাদমাধ্যমেও কিছু না বলে। বোঝা যায় বাড়ির লোকজন প্রিয়ঙ্কাকে রেজওয়ানুরকে ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য নানাভাবে বোঝাচ্ছিল, প্রিয়ঙ্কাও তার বিয়ের পক্ষে বাড়ির মত আদায়ের জন্য চেষ্টা করছিল এবং আশা করছিল শেষপর্যন্ত মত পাবে। সেজন্যই স্বামীকে আরও অপেক্ষা করতে বলল এবং বাপের বাড়ির পরামর্শে সরল মনে আইনের পথে না যেতে এবং সংবাদ মাধ্যমকেও না জানাতে স্বামীকে বলল।

এরপর রেজওয়ানুরের সাথে প্রিয়ঙ্কার সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পরে জানা যায়, যে অশোক টোডি অসুস্থ হয়ে নার্সিংহোমে আছে বলে প্রিয়ঙ্কাকে নিয়ে যাওয়া হোল, সেই টোডি প্রিয়ঙ্কাকে নিয়ে তিরুপতিতে গেছে। ফলে অসুস্থতার কথা যে ভাঁওতা সেটা নিশ্চয়ই বুঝতেই পারছেন আপনারা। যে লালবাজার এই ব্যাপারে এত তৎপর হয়ে বার বার চাপ দিয়ে, শেষপর্যন্ত থ্রেট করে প্রিয়ঙ্কাকে বাপের বাড়ি পাঠাতে বাধ্য করলো, এবং সেখানেই চুক্তি হল ৭ দিন বাদে স্ত্রীকে ফেরত পাঠাবে, সেই লালবাজার কিন্তু ৭ দিন পরে টোডিরা ফেরত পাঠিয়েছে কি না একবার তা খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজনও বোধ করলো না। তা করবে কেন? কাজ হাসিল হয়ে গেছে এবং ওরাই যে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যমণি। এরপর অনন্যোপায় হয়ে রেজওয়ানুর শেষ বারের মত সব কিছু জানিয়ে হিউম্যান রাইটস কমিশন, এ পি ডি আরকে চিঠি দেয় এবং তার কপি পুলিশ কর্তাদের দেয়। এই চিঠির শেষ দিকের কথাগুলো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ও বেদনাদায়ক। রেজওয়ানুর লিখছে, 'আমাকে হুমকি দেওয়া সত্ত্বেও আজ ১৯ সেপ্টেম্বর আমি শারীরিকভাবে অক্ষত আছি'। ভেবে দেখুন শারীরিক আক্রমণের কী ভীষণ আশঙ্কা নিয়ে সে দিন কাটাচ্ছিল। তারপর বাধ্য হয়ে রেজওয়ানুর শেষ চেষ্টা হিসাবে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। কথা ছিল, আইনজীবীর সাথে কথা বলতে ২১ সেপ্টেম্বর দুপুরে হাইকোর্ট যাবে, সেইভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্টও ছিল এবং হাইকোর্ট থেকে বেরিয়ে বিকালে সাংবাদিক সম্মেলন করবে। সেই মর্মে শেষ বার ১০-১১ মিনিটে রেজওয়ানুর এপিডিআর-এর সম্পাদকের সাথে ফোনে কথাও বলেছিল। বোঝা যায় একদিকে স্ত্রী প্রিয়ঙ্কাকে নিয়ে সুস্থ দাম্পত্য জীবনে বেঁচে থাকার প্রবল আশা এবং অন্যদিকে শারীরিক আক্রমণের আশঙ্কা নিয়ে রেজওয়ানুর তখন শেষ চেষ্টা হিসাবে আদালত, হিউম্যান রাইটস্ কমিশন এবং সংবাদ মাধ্যমের সাহায্যে জনগণের বিবেকের দরবারে হাজির হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যে টোডি নিযুক্ত ক্রিমিনালরা ও লালবাজারের কর্তারা নিশ্চয়ই ফোন ট্যাপ করে জেনে গেছে রেজওয়ানুর ২১শে দুপুরে হাইকোর্টে কেস করছে ও বিকালে সাংবাদিক সম্মেলন করছে, যেটা প্রিয়ঙ্কাকে দিয়ে ওরা আটকাবার চেষ্টা করেছিল। আর টোডিরাও অনেক চেষ্টা করেও কিছুতেই প্রিয়ঙ্কাকে বিবাহ বিচ্ছেদ করতে রাজি করাতে পারেনি। ফলে আর দেরি করা চলে না, হাইকোর্টে পৌঁছবার আগেই রেজওয়ানুরকে শেষ করার সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। যে যুবক ১০-১১ মিনিটে মধ্য কলকাতা থেকে এপিডিআর সম্পাদককে ফোন করেছিল, ১০-৩০ মিনিট নাগাদ তার ডেডবডি পাওয়া গেল পাতিপুকুর রেল লাইনে। সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছে, সুইসাইড করলে বা রেলে কাটা পড়লে, মাথা দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে যায়, শরীরের নানা জায়গা ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তা দেখা যায়নি। শুধু মাথার পেছনে বড় আঘাতের চিহ্ন ছিল। দেহের অন্য কোথাও কিছু ছিল না। তারা আরও অবাক হয়ে প্রশ্ন করেছে, সাধারণত রেলে কাটা পড়লে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায় বডি সরাতে, সুরতহাল হয়, শিয়ালদহ থেকে ডোমরা এসে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে সুরতহাল না করেই ডেড বডি সরিয়ে নেওয়া হয়, যেন আগের থেকেই সব ব্যবস্থা করা ছিল। এতক্ষণ আমি যেসব ঘটনার পূর্বাপর বিবরণ আপনাদের দিলাম তার সবটাই রেজওয়ানুরদের চিঠি ও সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যকে ভিত্তি করে। এবার আপনারাই বুঝে নিন, কীভাবে কী ঘটেছে।

পরবর্তী পর্ব লক্ষ্য করলে আপনারা এটা আরও পরিষ্কার বুঝতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই এই মর্মান্তিক সংবাদ পৌঁছবার সাথে সাথেই রেজওয়ানুরের পাড়া, সমগ্র পার্ক সার্কাস অঞ্চল বিক্ষোভে ফেটে পড়লো, পুলিশ যথারীতি লাঠি-টিয়ার গ্যাস চালালো, ঐ দিনই টিভি ও পরদিন সংবাদপত্রের মাধ্যমে সারা রাজ্যে অতি দ্রুত এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লো, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে সারা রাজ্যেও প্রবল ধিক্কার ধ্বনিত হলো। এতটা যে হবে আগে পুলিশ কর্তারা ও তাদের রাজনৈতিক প্রভুরা আন্দাজ করতে পারেনি। হয়তো তারা ভেবেছিল, পার্কসার্কাস এলাকার এক অখ্যাত গলির এক গরিব যুবকের মৃত্যু নিয়ে কে অত মাথা ঘামাবে; পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু হিন্দুরাও এই ধরনের বিয়ের বিরুদ্ধে যাবে, তা ছাড়া এর আগেও তো কত খুনকে রেল লাইনে সুইসাইড বলে চালানো গেছে। কিন্তু তাদের হিসাবে ভুল ছিল। সিপিএম নেতৃত্ব ও তাদের পূর্বসূরী কংগ্রেস নেতৃত্ব অনেক চেষ্টা করেও এ রাজ্যে সবকিছু ধ্বংস করতে পারেনি, পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল-সুভাষচন্দ্রদের ঐতিহ্যের প্রভাব এখনও কিছু বেঁচে আছে। তাছাড়া সাম্প্রতিক সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের উত্তপ্ত প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের মানসিকতাকে অনেকটা সাম্প্রদায়িক প্রভাবমুক্ত, গণতান্ত্রিক ও প্রতিবাদী করেছে। নন্দীগ্রামের জনগণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির জন্য মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির জামা মসজিদের ইমামকে পাঠিয়েও ব্যর্থ হয়েছেন। এটাও খুবই লক্ষণীয়। পশ্চিমবঙ্গের এই জাগ্রত চেতনাই রেজওয়ানুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মুখরিত হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে মুখ্যমন্ত্রীর স্নেহধন্য পুলিশ কমিশনার ২৩ সেপ্টেম্বর ড্যামেজ রিপেয়ার করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এও এক নজিরবিহীন ঘটনা। অভিযুক্ত দুই ডিসিকে দুই পাশে বসিয়ে তিনি প্রেস কনফারেন্সে সদম্ভে আস্ফালন করে জানালেন, 'পুলিশ অফিসাররা যা করেছে, ঠিকই করেছে। অতীতেও এ রকম করেছে, ভবিষ্যতেও আরও করবে।' দিন দুপুরে পথেঘাটে, ট্রেনে-বাড়িতে কত ডাকাতি-ছিনতাই, খুন-খারাপি হয়, নারীহরণ হয়, মেয়েদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, কিডন্যাপিং হয়, সাধারণ মানুষ বার বার অভিযোগ জানিয়েও পুলিশের কোনও সাহায্য পায় না, অথচ সেই পুলিশই অতিরিক্ত সক্রিয় হল টোডি পরিবারের স্বার্থে এই আইনসঙ্গত বিয়ে ভাঙতে। কারণ টোডিরা কোটি কোটি টাকার মালিক, তা ছাড়া ক্রিকেটের বেটিং চক্রের পাণ্ডা। এক মন্ত্রীর অভিযোগ, ক্রিকেট বোর্ডের নির্বাচনে এই অশোক টোডি বহু টাকা ঢেলেছে মুখ্যমন্ত্রীর প্রার্থী পুলিশ কমিশনারকে জেতাবার জন্য। ফলে ক্রিকেট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসাবে পুলিশ কমিশনারের কৃতজ্ঞতাবোধ তো থাকবে। ২৩ সেপ্টেম্বর প্রেস কনফারেন্সে পুলিশ কমিশনার আরেকটা নজিরবিহীন বক্তব্য রাখলেন। ঐ রকম পোস্টে বসে কোনও তদন্ত হওয়ার আগেই তিনি জানিয়ে দিলেন, 'রেজওয়ানুর হয় সুইসাইড

রাজ্যে শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-সিপিএম-পুলিশ প্রশাসন ক্রিমিনালদের এক ভয়াবহ দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে

করেছে না হয় মানসিক বিপর্যস্ত হয়ে রেল লাইনে হাঁটতে গিয়ে কাটা পড়েছে।' একথা বললেন যাতে খুন হয়েছে এটা কেউ না ভাবতে পারে, তদন্তও সুইসাইড বা অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। আপনারা লক্ষ্য করুন, খুনকে চাপা দেওয়ার জন্য কী জঘন্য পথ নিয়েছে স্বয়ং পুলিশ কমিশনার। আরও লক্ষ্য করুন কীভাবে সিপিএম নেতৃত্ব সাথে সাথে পুলিশ কমিশনার এবং টোডি পরিবারের পক্ষে দাঁড়াল। ঐ ২৩ সেপ্টেম্বরই সিপিএম রাজ্য সম্পাদকও বললেন, 'পুলিশ ঠিক কাজই করেছে, ওরা কোনও চাপ দেয়নি, আর পুলিশ জানতই না রেজওয়ানুর-প্রিয়ঙ্কার বিয়ে হয়েছে।' ভাবটা যেন ওরা অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিল, তাই পুলিশ বার বার ডেকেছে। যে পুলিশ কমিশনার টোডিদের পক্ষে কাজ করেছে, তার হয়ে কথা বলা পরোক্ষে টোডিদের হয়ে কথা বলারই সামিল। অথচ কি মুখ্যমন্ত্রী, কি সিপিএম নেতৃত্ব একটি বারও এই প্রশ্ন তুললেন না, লালবাজারে বসে বৈধ বিবাহ ভাঙবার মতো বেআইনি কাজ করার অধিকার পুলিশ কোথায় পেল? কেন তারা এ কাজ করলো? কেন প্রেস কনফারেন্স ডেকে আস্ফালন করলো ভবিষ্যতেও এ সব কাজ করবে? কেন তদন্ত হওয়ার আগেই ঘোষণা করে দিল, এটা মার্ডার নয়, হয় সুইসাইড বা অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথ? তার চেয়েও বড় কথা, কেন নিরাপত্তা চেয়ে রেজওয়ানুর-প্রিয়ঙ্কার ৩০ আগস্টের চিঠি পাওয়ার পরও লালবাজার কোনও নিরাপত্তা না দিয়ে এ ধরনের জঘন্য কাজ করলো? মুখ্যমন্ত্রী ও সিপিএম নেতৃত্ব এই সব কৈফিয়ৎ চাইবে কেন? যা কিছু ঘটেছে তাদের জ্ঞাতসারে, অনুমোদনে ও নির্দেশেই তো ঘটেছে। মনে রাখবেন, আজকাল পশ্চিমবঙ্গে যেকোনও থানা হতে শুরু করে খোদ লালবাজারের কোনও কর্তা এক পাও নড়ে না উপরওয়ালা অর্থাৎ সিপিএম প্রভুদের নির্দেশ ছাড়া। ওদের হাতেই ট্রান্সফার, প্রমোশান সব কিছু। এটাও মনে রাখবেন, গদি রাখার তাগিদে বড় বড় শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের সাথেই সিপিএম নেতাদের ও পুলিশ কর্তাদের দুবেলা ওঠাবসা-খানাপিনা-আদর আপ্যায়ন চলে। পুলিশকে দিয়ে ওরা ক্রিমিন্যালদের কন্ট্রোল করে। ভোটে প্রয়োজন অঢেল টাকা ও প্রচার, এটা দেবে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি-ব্যবসাদাররা, আর ভোটে থ্রেট-রিগিংয়ের জন্য প্রয়োজন পুলিশ ও ক্রিমিনাল বাহিনী। ফলে এ রাজ্যে শিল্পপতি-ব্যবসায়ী-সিপিএম-পুলিশ প্রশাসন ক্রিমিনালদের এক ভয়াবহ দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে। এরাই আন্ডারওয়ার্ল্ডকে কন্ট্রোল করে, এদের হাতেই সব। ফলে ধনী ব্যবসায়ী টোডি পরিবারের স্বার্থে পুলিশ ও সিপিএম নেতৃত্ব কাজ করবে না তো কে করবে!

এ কথাও আমরা জানি, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় চিরদিনই রাষ্ট্র, মিলিটারি-পুলিশ সবকিছু শোষিত জনগণের উপর অত্যাচার-নিপীড়নের হাতিয়ার। এর মধ্যেও বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রথম যুগে যতটুকু মানবিকতা ছিল, সাম্রাজ্যবাদী যুগে তাও ধুলিস্যাৎ হয়ে গেছে। এমনকী ওদের গড়া সংবিধান-আইন ওরা প্রথমদিকে যতটা মেনে চলত, আজ নিজেদের প্রয়োজনে সেই সংবিধানকে পাল্টাতে, আইনকে পাল্টাতে এবং ভাঙতে এতটুকু দ্বিধা করে না। ওদের 'পবিত্র অলংঘনীয় সংবিধান'কেও ওরাই কত বার লংঘন ও অপবিত্র করেছে! সরকারি নেতারা মুখে বুলি আওড়ায় 'আইন', 'ন্যায় বিচার' নিজের পথে চলবে, কিন্তু বাস্তবে আইন ও ন্যায় বিচার ওদের নির্দেশে, ওদের নির্ধারিত পথেই চলে। ওরা দিনকে রাত, রাতকে দিন বানাতে পারে। এক কলমের খোঁচায় খুনি নির্দোষ ও সাধু বনে যায়, আর নির্দোষ খুনি হয়ে সাজা পায়। তাই গরিব মানুষ অতি দুঃখে বলে, 'এ দুনিয়ায় যার টাকা আছে, তার জন্য থানা-পুলিশ, আইন-আদালত সব কিছু আছে। যার টাকা নেই, তার কিছুই নেই।' পুলিশের বড় কর্তারা বলে, তারা নাকি পাবলিক সার্ভেন্ট, অর্থাৎ পাবলিক হচ্ছে মনিব, আর ওরা চাকর। কিন্তু বাস্তব কী বলে? পুলিশের বড়বাবু কাউকে ডেকে পাঠালে বুক ধড়ফড় করে কেন? চাকরের এমন ডাক যে মনিবের বুক কাঁপে! বুঝেই দেখুন এ কেমন জনতার চাকর! আবার এই পুলিশ অফিসাররাও চাকর। কার চাকর? ওরা হচ্ছে বড় বড় শিল্পপতি-ব্যবসাদার ও সরকারি দলের চাকর। ফলে রেজওয়ানুরের হত্যাকাণ্ড একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। কংগ্রেস-বিজেপি ও অন্য আঞ্চলিক বুর্জোয়া দল শাসিত রাজ্যগুলিতেও প্রায় একই দশা। তবে সেখানকার সরকারি দলগুলি সিপিএমের মতো এত সংগঠিত নয় বলে মাঝে মাঝে এদের থেকেও অনেক কাঁচা কাজ করে ফেলে। আজকাল এইসব সরকারি নেতারা প্রায়ই বলেন, ক্রিমিনালাইজেশন অফ পলিটিক্স হচ্ছে। এক দল অন্য দলের বিরুদ্ধে আঙুল তুলছে, ভাবটা তারা নিজেরা যেন সাধু। এভাবে পাবলিককে ঠকায়। বাস্তবে এরা সকলেই ক্রিমিনাল পুষছে, ক্রিমিনাল ছাড়া আজ আর ওদের রাজনীতি চলে না। বহুদিন আগে ১৯৬৩ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের এক বিচারপতি এ এন মোল্লা একটি মামলার রায় দিতে গিয়ে গভীর উৎকণ্ঠায় বলেছিলেন, 'আমি দীর্ঘদিন আইন ব্যবসায় আছি। আমার অভিজ্ঞতা হচ্ছে, পুলিশের মত এমন সংঘবদ্ধ আইনসিদ্ধ গুণ্ডাশক্তি আর নেই।' চর্তুদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। সরকার রায় থেকে এই অংশ বাদ দিতে বললো, কারণ পুলিশের মর্য্যাদা থাকবে না। তিনি রাজি হলেন না। পরে উর্ধ্বতন আদালত ঐ অংশ রায় থেকে বাদ দিয়ে দেয়। জাস্টিস মোল্লা সেদিন পুলিশকে চিনেছিলেন, কিন্তু পুলিশের পেছনে ক্রিমিনাল রাজনৈতিক শক্তি, আর তারও পেছনে মানি পাওয়ারকে দেখতে পাননি। এবার আপনারা দেখলেন না, কীভাবে টাটাদের স্বার্থে সিঙ্গুরে ও সালিমদের স্বার্থে নন্দীগ্রামে পুলিশের সাথে সশস্ত্র ক্রিমিনাল বাহিনীকে সিপিএম নামিয়েছে গরিব কৃষক ও খেতমজুরদের আন্দোলন দমন করার জন্য। কীভাবে শুধু গুলি চালিয়ে হত্যা করেও ক্ষান্ত হয়নি, মহিলাদেরও নির্বিচারে ধর্ষণ করিয়েছে।

প্রথমে পুলিশ কমিশনারের পক্ষে খোলাখুলি বলার পর সিপিএম নেতৃত্ব দেখল রাজ্যে জনরোষ তাদের বিরুদ্ধেও বাড়ছে। নিচুস্তরের কর্মীরা বিশেষভাবে সংখ্যালঘু এম এল এ- এম পি-মন্ত্রীরা জানালো, আগামী পঞ্চায়েতে ভোট ব্যাঙ্কে ধস নামবে। তারা কেউ কেউ দাবি তুললো, দোষীদের শাস্তি দিতে হবে, তদন্ত করতে হবে। এই অবস্থায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ৮ অক্টোবর বলেন, 'পুলিশ কমিশনারের বক্তব্য খারাপ হয়েছে। তাঁর এভাবে বলা ঠিক হয়নি।' লক্ষ্য করুন, পুলিশ কমিশনার বলেছেন ২৩ সেপ্টেম্বর, সেদিন শোনামাত্রই সারা রাজ্যে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে। সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সেদিনই পুলিশ কমিশনারকে সমর্থন করলেন। আর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ১৫ দিন পরে বুঝলেন, পুলিশ কমিশনারের এভাবে বলা খারাপ হয়েছে। যেকথা শোনা মাত্র এ রাজ্যের সকলেই প্রতিবাদ করেছে, ওদের বুঝতে ১৫ দিন দেরি হল কেন? কারণ দেরিতে হলেও তারা বুঝেছেন, ভোটের স্বার্থে মুখ রক্ষার জন্য এখন এরকম কিছু বলতে হবে। পাশাপাশি শুরু হলো তদন্তের প্রহসন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথমে সিআইডি তদন্ত ঘোষণা করলেন। অর্থাৎ পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের তদন্ত পুলিশই করবে। তারপর এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠায় তিনি নিজের পছন্দ মতো একজন প্রাক্তন বিচারপতিকে দিয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা করলেন। অথচ প্রথা হচ্ছে, রাজ্য সরকার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে অনুরোধ করবে, প্রধান বিচারপতি কর্মরত কোন বিচারপতিকে দিয়ে তদন্ত করাবেন এবং যাঁর জুডিশিয়াল পাওয়ার থাকবে, যেটা অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির থাকে না। প্রশ্ন উঠল, পুলিশ কমিশনার ও ডিসিদের দায়িত্বে রেখে কীভাবে তদন্ত হবে, কেন তাদের সাসপেন্ড বা সরানো হচ্ছে না। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী দু'জনকে সরাবেন বলেছেন। ঐ দিনই বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রেসকে বলেছেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে তিনি কিছু বলতে চান না। অথচ কাউকে সরালো না, এরা সকলেই বহাল তবিয়তেই থাকলেন। মুখ্যমন্ত্রী অজুহাত দিলেন, তদন্ত চলছে, এখন কাউকে সরানো যাবে না। কোন্ আইন বলেছে তদন্ত চলাকালীন অভিযুক্তদের সরানো যায় না? বরং তদন্তের স্বার্থেই তো সরানো দরকার। প্রশ্ন উঠেছে, কেন খুনের তদন্ত হচ্ছে না। সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারেল হাইকোর্টে বললেন, রেজওয়ানুরের দাদা খুনের অভিযোগ করেনি, অস্বাভাবিক মৃত্যুর কথা বলেছে। যেন খুন হওয়া অস্বাভাবিক মৃত্যু নয়, একমাত্র সুইসাইড ও অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথকেই অস্বাভাবিক মৃত্যু বলা হয়। তাছাড়া যদি রেজওয়ানুরের দাদা অনভিজ্ঞতাবশত কিছু ত্রুটি করেও থাকে, পুলিশ কি তাকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করবে? এমনিও যদি কোথাও রেল লাইনে ডেডবডি পাওয়া যায় এবং কেউ অভিযোগ না জানায়, তাহলেও এটা কি পুলিশের আইনসঙ্গত দায়িত্ব নয়, খুন হয়েছে কি না, হলে কারা করেছে অনুসন্ধান করা? অথচ শয়তানি করে ওরা একের পর এক কুযুক্তি করছে। ময়না তদন্ত নিয়েও স্বাভাবিকভাবেই আশঙ্কা ও সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এটা সকলেই জানে হাসপাতালগুলিতে আজকাল ডাক্তার, কর্মচারী নিয়োগে শিক্ষাগত ও পেশাগত যোগ্যতার চেয়েও সিপিএম দলের প্রতি আনুগত্যকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। ফলে হাসপাতালের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ব্যাপক দুর্নীতি, রুগীদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলছে। ব্যতিক্রম হিসাবে কিছু সৎ বিবেকবান ডাক্তার, নার্স, কর্মচারী অবশ্যই আছেন, কিন্তু তারা লুপ্তপ্রায়। এবার আপনারা দেখেছেন হাসপাতালে নন্দীগ্রামের কত মা-বোনেরা কাঁদতে কাঁদতে তাদের উপর ধর্ষণের বীভৎস কাহিনী বলেছেন, কিন্তু উপরওয়ালার হুকুমে কোন ডাক্তারই রেকর্ড করায়নি। যার উপর দাঁড়িয়ে সিপিএম নেতারা, মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ধর্ষণের অভিযোগ মিথ্যা, এর কোন প্রমাণ নেই। রেজওয়ানুরের ক্ষেত্রেও যে একই জিনিস ঘটবে না, ডাক্তাররা ময়না তদন্তে সুইসাইড বা অ্যাক্সিডেন্টাল ডেথের রিপোর্ট দেবে না, তার কী গ্যারান্টি আছে? ইতিমধ্যেই পিজি হাসপাতালের ফরেনসিক ডিপার্টমেন্টের প্রধান সংবাদমাধ্যমে বলেছেন, কয়েকজন ফরেনসিক টেস্ট মেডিসিনের বিশেষজ্ঞ নিয়ে এই ধরনের একটি সেনসেটিভ কেসে বোর্ড গঠন করে পরীক্ষা করানো উচিত ছিল। ফলে বুঝতেই পারছেন কী ঘটতে চলেছে বা ঘটাবার চেষ্টা হচ্ছে।

বোঝাই যায় তদন্তের প্রহসন ঘটিয়ে সরকার সবকিছু ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করবে। এ জন্য তদন্তের নামে কালহরণ করে চাইছে পাবলিক সেন্টিমেন্ট থিতিয়ে যাক। কিন্তু সিপিএম নেতৃত্ব ও সরকারের এই চেষ্টাও ব্যর্থ করা যায়, যেমন ব্যর্থ করেছে নন্দীগ্রাম। সেখানে ঐক্যবদ্ধ জনগণ আজও এই দাবিতে দাঁড়িয়ে আছে যে, খুনি ও ধর্ষণকারীদের শাস্তি না দিলে পুলিশ প্রশাসনকে কাজ করতে দেবে না। এত মাস হয়ে গেল এখনও পুলিশ প্রশাসন ঢুকতে পারেনি, লাগোয়া সীমান্ত থেকে প্রতিদিন গুলি চালিয়ে, আরও খুন করেও মানুষকে টলাতে পারেনি। এইরকম যদি পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র রেজওয়ানুরের খুনিদের শাস্তির দাবিতে জনগণ অটল থাকেন, প্রতিবাদে মুখর থাকেন, তা হলে শেষ পর্যন্ত সিপিএম নেতৃত্ব ও রাজ্য সরকারকে নূতন করে ভাবতে হবে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের ধাক্কা এখনও সিপিএম সামলাতে পারেনি। সামনে পঞ্চায়েত ভোট, লোকসভা ভোটও তাড়াতাড়ি হতে পারে। ভোট ব্যাঙ্ক ভাঙতে পারে এই আশঙ্কায় যেভাবেই হোক ম্যানেজ করার চেষ্টা চালাবে সিপিএম। তখন হয়ত চুনোপুঁটি কয়েকজনকে বলির পাঁঠা করবে।

খুনিদের শাস্তির দাবিতে এস ইউ সি আই-এর গণস্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে। ছবি ১১ অক্টোবর হাজরা ও শ্যামবাজার

তাতেও কাজ হবে না বুঝলে রাঘব বোয়ালদের ট্রান্সফার বা অন্যকিছু করে আপাতত সামাল দেওয়ার চেষ্টা করবে, পরে অবশ্য বড় প্রমোশান দিয়ে পুষিয়ে দেবে। নিতান্ত বাধ্য হলে হয়তো অশোক টোডিকেও গ্রেপ্তার করতে পারে, যদিও কেস এমন সাজাবে যাতে দ্রুত জামিন পায় ও সাজা না হয়। অর্থাৎ ওরা শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবে খুনিদের বাঁচাতে। এরপরও একমাত্র গণআন্দোলনের তীব্রতা বাড়ানো গেলে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করা যাবে। অন্য কোনও পথে নয়। জনগণকে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, সিপিএম নেতারা পারে না এমন ভণ্ডামি নেই। আর মুখ্যমন্ত্রী তো একজন পাকা নাট্যকার ও দক্ষ অভিনেতা। যদিও নন্দীগ্রামে অনেক অভিনয় করেও তিনি সফল হননি।

কিন্তু তদন্তের রিপোর্ট যা-ই বলুক, জনগণ বুঝে গেছে রেজওয়ানুরকে খুন করা হয়েছে এবং কারা কেন খুন করেছে, এটাও বুঝেছে। জনগণ তাদের ক্ষমা করবে না, ঘৃণার আগুনে দগ্ধ করবে, এটা আমরা জানি। আমরা জানি, এই দেশের পুলিশ প্রশাসন, বিচার বিভাগ কাদের হয়ে কাজ করে। নন্দীগ্রামের জনগণ পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, ওদের আইন-কানুনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি-জমি রক্ষা করেছে। জনগণের এই সচেতন, সংঘবদ্ধ গণআন্দোলনের শক্তিই সবচেয়ে

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09

রেজওয়ানুরের খুনিদের শাস্তির দাবিতে ১৪ অক্টোবর মৌনমিছিল। পুরোভাগে এস ইউ সি আই পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, ডাঃ অশোক সামন্ত, অধ্যাপক তরুণ নস্কর প্রমুখ

সন্তানহারা মা কিসোয়ার জাহান শুধু চান 'ইনসাফ'

বড় শক্তি। সর্বত্র এই শক্তির উপরই জনগণকে নির্ভর করতে হবে।

আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, যে অশোক টোডিরা ভাঁওতা দিয়ে প্রিয়ঙ্কাকে সরিয়ে নিয়ে গেল, তাদের হেপাজতেই পুলিশ প্রিয়ঙ্কাকে এমনভাবে রেখে দিয়েছে, যাতে কোনও সংবাদমাধ্যম দেখা করে তার মতামত জানতে না পারে। প্রিয়ঙ্কার উপর তো তার শ্বশুরবাড়িরও আইনগত অধিকার আছে, কিন্তু তারা চাওয়া সত্ত্বেও যোগাযোগ করতে দেওয়া হল না কেন? প্রিয়ঙ্কা কি অস্বীকার করেছে? এর কোনও উত্তর সরকার বা পুলিশ কর্তারা দেবে না। কারণ তাদের আশঙ্কা প্রিয়ঙ্কাকে বাপের বাড়িতে রেখে অবিরাম অনেক মিথ্যা বুঝিয়ে, বাবা-মার চোখের জল দেখিয়ে খানিকটা মন ঘোরাতে না পারলে সে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে অশোক টোডি ও পুলিশ কর্তাদের আবার বিপদে ফেলবে। অবশ্য কাউকে দেখা করতে দেয়নি, তা নয়। সরকার নিযুক্ত মহিলা কমিশনে সিপিএমের নিজস্ব লোকদের দেখা করতে দিয়েছে। এই কুখ্যাত মহিলা কমিশনই রায় দিয়েছিল সিঙ্গুরে তাপসী মালিককে কেউ ধর্ষণ ও খুন করেনি, সে আত্মহত্যা করেছে, নন্দীগ্রামে মহিলারা ধর্ষিতা হয়নি। সেই মহিলা কমিশনই প্রিয়ঙ্কার সঙ্গে দেখা করে তার হয়ে জানিয়েছে, 'প্রিয়ঙ্কা সংবাদ মাধ্যমের সাথে দেখা করতে চায় না, এবং পুলিশ তার সাথে ভাল ব্যবহার করেছে'। এই দুটো কথারই এই মুহূর্তে সিপিএম নেতৃত্ব, রাজ্য সরকার ও পুলিশ কর্তাদের খুব প্রয়োজন ছিল। অবশ্য প্রিয়ঙ্কা আসলে কী বলেছে, কে জানে। তবে তাকে পুরোপুরি 'ঠিকঠাক' না করা পর্যন্ত যে সংবাদমাধ্যমকে এবং অন্য কাউকে তার কাছে যেতে দেওয়া হবে না, এটা নিশ্চিত।

আপনারা জানেন, আমাদের দল এস ইউ সি আই গদির রাজনীতি করে না। আমরা ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতি করি না। সিপিএম আমাদের সিটের লোভ দেখিয়ে টানতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা প্রত্যাখান করেছি। আমরা জানি ওরা মার্কসবাদের আলখাল্লা পরলেও কোনও দিনই যথার্থ কমিউনিস্ট দল ছিল না, কিন্তু গত শতাব্দীর সত্তরের দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত ওরা যতটুকু বামপন্থার চর্চা করত, তাও প্রায় জলাঞ্জলি দিয়েছে দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের কৃপায় গদি রক্ষার স্বার্থে। আবার আমরা দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস, তৃণমূলদের সাথেও নেই। কারণ ওরাও পুঁজিপতি-ব্যবসাদারদের স্বার্থেই কাজ করে। সরকারি গদিতে নেই বলে বিরোধিতার মহড়া দেয়, গদি পেলে একই চেহারা নেবে। যেমন কেন্দ্রে কংগ্রেস-বিজেপি একের বিরুদ্ধে অপরে গরম ভাষণ দেয়, এ রাজ্যেও একদিকে সিপিএম, অন্যদিকে কংগ্রেস, তৃণমূল সেই রকমই 'লড়াই করে' ভোটের দিকে তাকিয়ে। আর আমাদের কর্মীরা শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-মহিলা মধ্যবিত্তদের নানা দাবিতে বুকের রক্ত ঢেলে লড়ে, প্রাণ দেয়, প্রাথমিকে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তন সহ কিছু কিছু দাবিও আদায় করে। সিপিএমের ক্রিমিনাল ও পুলিশ এ পর্যন্ত আমাদের দলের ১৪১ জন নেতা-কর্মীকে খুন করেছে, বুলেট-লাঠিতে কয়েকশত আহত পঙ্গু হয়ে আছে। ২৬ জন নেতা-কর্মীকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে যাবজ্জীবন দণ্ড করিয়েছে। আরও ১০৫ জনের বিরুদ্ধে ফলস মার্ডার কেস করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ও এ দেশে আর কোনও রাজনৈতিক দলের উপর এত সরকারি আক্রমণ হয়নি। এত করেও আমাদের দমাতে পারেনি, কোনও বিপ্লবী দলকেই এভাবে দমানো যায় না। সকলেই জানেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনেও আমরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছি। রেজওয়ানুর হত্যার প্রতিবাদে প্রথম বিক্ষোভ সংঘটিত হয় পার্ক সার্কাস এলাকায়। তারপর রাজনৈতিক দল হিসাবে এস ইউ সি আই দলই প্রথম বিক্ষোভ সংগঠিত করে লালবাজারে প্রবল বর্ষার মধ্যে ২৪ সেপ্টেম্বর। পুলিশের লাঠিতে আমাদের কর্মীরা আহত হয়, ২৭ জন গ্রেপ্তার হয়। সারা রাজ্যে আমরা বহু প্রতিবাদ সভা করেছি। ১১ অক্টোবর সারা রাজ্যে প্রতিবাদ দিবস পালন করছি, কয়েক শত সভা হবে। এবং দাবিপত্রে জনগণের স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু হয়ে চলতে থাকবে রাজ্যপালের কাছে জমা দেওয়ার জন্য। আমরা সিআইডি তদন্ত প্রত্যাখান করেছি, কারণ এই সংস্থা রাজ্য সরকারের অধীন। সিবিআই তদন্তও আমরা সমর্থন করিনি, কারণ এটা কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, এরও রেকর্ড ভাল নয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারও সিপিএমের বন্ধু সরকার। এটাও আপনারা সংবাদপত্রে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, হঠাৎ পুলিশ কমিশনার দিল্লিতে গিয়ে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু সিবিআই প্রধানের সাথে অনেকক্ষণ গোপনে শলাপরামর্শ করেছেন। এর কারণ বোঝা কি অসম্ভব? আমরা প্রথমে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেও পরে মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির উপর ছেড়ে না দিয়ে নিজের পছন্দ মতো লোক ঘোষণা করায় সেই দাবিও প্রত্যাহার করেছি।

এই অবস্থায় আমরা দাবি করছি, ১) জনগণের আস্থাভাজন বিচারপতি, আইনবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিকদের নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করতে হবে এবং এই কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে, ২) খুনি অশোক টোডিদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তি দিতে হবে, ৩) খুনের সহযোগী পুলিশ অফিসারদের গ্রেপ্তার, বরখাস্ত ও শাস্তি দিতে হবে। এই দাবিগুলির ভিত্তিতেই রাজ্যের সর্বত্র আন্দোলন সংগঠিত করা হবে। আশা করি আপনারা সর্বাত্মক সাহায্য করে যাবেন।

স্থানীয় তৃণমূল বিধায়কের ভূমিকা নিয়েও কিছু বলতে চাই। জনপ্রতিনিধি হিসাবে তার তো উচিত ছিল জনমত সংগঠিত করে বিপদের দিনে রেজওয়ানুরদের পাশে দাঁড়ানো, পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সংগঠিত করানো। তাহলে হয়তো এই ষড়যন্ত্র রোখা যেত, রেজওয়ানুরকেও বাঁচানো যেত। কিন্তু তিনি তো তা করলেনই না, বরং অশোক টোডি ও পুলিশের পক্ষে কথা বলেছেন বলে রেজওয়ানুরের পরিবার জানিয়েছে। কারণ হিসাবে তিনি বলেছেন, তার উপর পুলিশের চাপ ছিল! এটা কি কাপুরুষতা নয়? এ নিয়ে তো তৃণমূল কোনও সমালোচনা করলো না! কেন করলো না, আপনারা ভেবে দেখবেন।

আর একটি কথা বলা দরকার। সর্বত্র সিপিএম ও রাজ্য সরকার যখন কোণঠাসা, তখন তাদের এক বন্ধু জুটে গেছে। সে বন্ধু হচ্ছে বিজেপি দল। এত প্রতিবাদ দেখে, ধর্মীয় সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠা ব্যাপক জনগণের দৃঢ় ভূমিকা দেখে আতঙ্কিত বিজেপি বলছে, রেজওয়ানুর নিয়ে বাড়াবাড়ি হচ্ছে, এখন বন্যা নিয়ে কিছু করা দরকার। যেন তারা বন্যা নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ও অনেক কিছু করছে। ওরা কিছুই করেনি। বন্যার্তদের নিয়ে আমরাই লড়ছি মেদিনীপুরে ও অন্যত্র। গত ৫ অক্টোবর কলকাতায় কয়েক হাজার বন্যার্তদের প্রতিবাদ মিছিল আমরা করেছি মন্ত্রীদের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। আবার, আমরা রেজওয়ানুরের খুনের বিরুদ্ধেও লড়াই করছি।

পরিশেষে, আমি রেজওয়ানুর ও তার পরিবার যে বলিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন, এর জন্য তাদের শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। স্থানীয় যে জনগণ প্রথম প্রতিবাদ সংগঠিত করেছেন তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে যারা এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে মুখরিত হয়েছেন। অভিনন্দন জানাচ্ছি সাংবাদিকদের যারা বলিষ্ঠভাবে এই প্রতিবাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

রেজওয়ানুর আজ পশ্চিমবঙ্গে কয়েক কোটি পিতামাতার সন্তান। শোকসন্তপ্ত রেজওয়ানুরের মা আজ শত সহস্র সন্তানের জননী। আমাদের সংগ্রামের লক্ষ্য গণআন্দোলনের প্রভাবে এমন পরিবেশ গড়ে তোলা যাতে আগামী দিনে আর কোনও রেজওয়ানুকে এভাবে প্রাণ না দিতে হয়, আগামী দিনে শত সহস্র রেজওয়ানুর-প্রিয়ঙ্কার নিষ্পাপ ভালবাসাকে কেউ যেন হত্যা করতে না পারে।

মনে রাখবেন, রেজওয়ানুরের শোকার্ত জননী অন্য কিছু চাইছেন না, তিনি শুধু চাইছেন 'ইনসাফ', ন্যায়বিচার। এই ন্যায়বিচার কে দিতে পারে? দিতে পারে একমাত্র এরাজ্যের সংগ্রামী জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

আজ এখানেই শেষ করছি।

সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্তর্জাতিক সম্মেলন

২৮-২৯ নভেম্বর, ২০০৭, মহাজাতি সদন, কলকাতা

র‍্যামসে ক্লার্ক, নীনা আন্দ্রিয়েভা এবং আরব, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন

২৭ নভেম্বর মার্কিন তথ্য দপ্তরে প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশ

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৯১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in